৭।

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 29 JUL 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে নতুন শিক্ষাক্রম প্রসঙ্গে

হেনা দাস

রকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় বোর্ড ক ১৯৯৮-এর এসএসসি দের জন্য চলতি শিক্ষাবর্ষ নবম শ্রেণীতে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি চালু করেছে এবং এই তি পদক্ষেপের ফলে ঘটেছে চরম বিশৃঙ্খলা। চার মাস পর্যন্ত পরিবর্তিত নতুন পাঠ্যবই বাজারে পাওয়া যায়নি। এতে মূল্যবান সময়ের যেমন অপচয় হয়েছে তেমনি দ্বিগুণ, তিনগুণ দাম দিয়ে বই কিনতে যেয়ে অভিভাবকদের দারুণ হিমশিম খেতে হয়েছে। কিন্তু এটা হল সমস্যার একটি গৌণ দিকমাত্র। মূল সমস্যাটি দেখা দিয়েছে বহু বিশেষজ্ঞ ও আমলাদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মস্তিষ্ক থেকে প্রসূত নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির চেহারা নিয়েই।

নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সংক্রান্ত পুস্তিকাটি পাঠ করে বিস্মিত ও স্তম্ভিত না হয়ে পারা যায় না। প্রথমেই মনে প্রশ্ন জাগে এর উদ্দেশ্য কি? এটা কি প্রণীত হয়েছে সব গ্রুপের ছাত্রছাত্রীদের সব বিষয়ে পন্ডিত তৈরির জন্য, না কি বিষয়ের অতিরিক্ত ভারে মাথা গুলিয়ে দিয়ে তাদের মূর্খ বানাবার জন্য অথবা নকলবাজি ও ফাঁকিবাজিকে উৎসাহিত করার জন্য? শিক্ষাক্রম ও সিলেবাসের অচিন্তনীয় বিস্তার ও বোঝা দেখে মনে হয় গরিব, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান যারা গৃহশিক্ষক রাখতে পারে না, পশ্চাৎপদ পরিবেশে সমস্যাজর্জরিত স্কুলে পড়াশোনা করে এবং মেধা বিকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছেলেমেয়ের মাধ্যমিক স্তর উত্তীর্ণ হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা ও উচ্চশিক্ষার প্রসারকে সঙ্কুচিত করাই যেন এর উদ্দেশ্য।

শিক্ষাক্রমে পরিবর্তনের এই ধারা বা প্রক্রিয়া '৯৬-এর পরীক্ষার্থীদের সময় থেকেই কিছুটা শুরু হয়। এই পরিবর্তনের প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বাধ্যতামূলক বিষয়ের সংখ্যা বাড়িয়ে ৮টি করা হয়েছে এবং ২টি নৈর্বাচনিক ও একটি ঐচ্ছিক বিষয়সহ আরও তিনটি বিষয় যুক্ত করা হয়েছে অর্থাৎ মোট ১০০০ নম্বরের সীমার মধ্যেই ছাত্র-ছাত্রীদের পড়তে হবে ১১০০ নম্বরের ১১টি পত্রের বিষয়বস্তু। অবশ্য ঐচ্ছিক বিষয়টি না নিলেও চলে। কিন্তু যারা নেবে না তারা যে নম্বরের প্রতিযোগিতায় অনেক পেছনে পড়ে যাবে এবং হতাশায় ভুগবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সম্প্রতি উদ্বেগ আরও বেড়েছে এ কারণে যে, একটি সার্কুলার প্রচার করে আরও ১০০ নম্বরের একটি পত্র যুক্ত করে মোট নম্বর ১২০০-তে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে। আমরা যখন পাঠ্য বিষয় ও পাঠ্যসূচি বিশ্লেষণ করব তখন দেখা যাবে বিষয়ের বিস্তার ১১০০ বা ১২০০ নম্বরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না, প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার্থীদের কমপক্ষে মোট ১৫০০ নম্বরের ১৫টি পত্রের বিষয়বস্তু পাঠ করতে হবে।

এবারে বাধ্যতামূলক বিষয়গুলো সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করছি। প্রথমত, কৃষি শিক্ষা বা গার্হস্থ্য অর্থনীতিকে বাধ্যতামূলক বিষয়ের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার কোন যৌক্তিকতা আছে বলে মনে করি না। উল্লেখ্য যে, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কেবলমাত্র মেয়েদের জন্য, তবে তারা এর পরিবর্তে কৃষি শিক্ষাও পড়তে পারবে। আমরা লক্ষ্য করছি যে, অধিকাংশ মেয়েদের স্কুলে কৃষি শিক্ষার পরিবর্তে গার্হস্থ্য অর্থনীতি শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এর ফলে বিজ্ঞান শাখার ভাল মেধাবী ছাত্রী-দেরকেও এ বিষয়টি পড়তে হচ্ছে এবং এটা একটা অকারণ বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাছাড়া মেয়েদের জন্য এই ভিন্ন শিক্ষাসূচি অন্তর্ভুক্ত করে জাতিসংঘের মহিলা বিষয়ক সনদের (নারী সমাজের বিরুদ্ধে বৈষম্য অপনোদন সংক্রান্ত) তৃতীয় অধ্যায়ের ১০-এর (খ) ধারাটিকে লংঘন করা হয়েছে। নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই ধারায় নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে অভিন্ন ও একই ধরনের শিক্ষাসূচি অনুসরণের সুপারিশ করা হয়েছে এবং আন্তর্জাতিকভাবে এসব সুপারিশ যুক্তিযুক্ত বলে স্বীকৃত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, কৃষি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার বিরুদ্ধে একটি যুক্তিই যথেষ্ট। যুক্তিটি হল সব ছাত্রছাত্রীকে কৃষিবিদ বা কৃষিবিজ্ঞানী তৈরি করার কোন চাহিদা নেই এবং সবাই এ বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহীও হবে না। অতএব কৃষি শিক্ষা ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি এই দু'টি বিষয়কেই বাধ্যতামূলক বিষয়ের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে নৈর্বাচনিক বিষয়ের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার কথা ভাবা উচিত।

আর একটি বাধ্যতামূলক বিষয় হচ্ছে ধর্ম। ধর্মকে বাধ্যতামূলক করার একটা ইতিহাস রয়েছে এবং এই ইতিহাসের সাথে জড়িয়ে আছে শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা আমদানির বিষয়টি। এ প্রসঙ্গে পাকিস্তানী আমলের বিবরণ বাদ দিয়ে হাল আমলের কথাই শুধু উল্লেখ করছি। তবে এটুকু বলা প্রয়োজন যে, পাকিস্তান আমলেও ৯ম/১০ম শ্রেণীতে ধর্ম বাধ্যতামূলক ছিল না। এমনকি স্বাধীন বাংলাদেশেও এরশাদ আমলে 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' ঘোষণার আগে পর্যন্ত এ বিষয়টি বাধ্যতামূলক ছিল না। 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' ঘোষণার পরপরই ধর্মকে বাধ্যতামূলক বিষয়ের তালিকাভুক্ত করা হয় এবং নতুন শিক্ষাক্রমেও তা অপরিবর্তিত রয়েছে অথচ লক্ষ্য করা যায় এক্ষেত্রে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নেয়া হয়েছে। নতুন শিক্ষাক্রম সংক্রান্ত পুস্তিকায় বলা হয়েছে সংখ্যালঘুদের 'ধর্ম শিক্ষক না থাকলে' তারা ঐচ্ছিক গুচ্ছ থেকে যেকোন একটি বিষয় পড়তে পারবে। এতে প্রকৃতপক্ষে সংখ্যা-লঘুদের ধর্মীয় শিক্ষক নিযুক্ত না করার এবং কর্মরতদের চাকরিচ্যুত করার যুক্তিটিই উৎসাহিত হয়েছে। স্টাফিং প্যাটার্নের সুপারিশে একজন মাত্র মুসলিম ধর্মীয় শিক্ষক রাখার বিধানটি এই যুক্তির প্রয়োগে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করছে। এতে যেমন সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে তেমনি শিক্ষাদানে জটিলতাও সৃষ্টি করা হয়েছে। এই জটিলতার ফলে বহু স্কুলে সংখ্যালঘুরা শিক্ষকের সহায়তা ছাড়াই বিকল্প বিষয় পাঠ করতে বাধ্য হচ্ছে। সংখ্যালঘুদের প্রতি এই অবহেলা তাদের মনোজগতে সাম্প্রদায়িক ভাবধারা সৃষ্টির উপাদান যোগাচ্ছে এবং তারা হীনম্মন্যতায় ভুগছে। কেবল-মাত্র মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য ইসলাম ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক করার পদক্ষেপের দ্বারা বাধ্যতামূলক বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে সর্বজনীনতার নীতি তথা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে অভিন্ন শিক্ষাসূচি অনুসরণের নীতিও লংঘন করা হয়েছে। আধুনিক শিক্ষার ধর্মনিরপেক্ষ রূপ ও মানবিক গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে ধর্মকে বাধ্যতামূলক বিষয়ের তালিকা থেকে নৈর্বাচনিক বিষয়ের তালিকায় স্থানান্তরিত করা যুক্তিযুক্ত।

এবারে আর একটি বাধ্যতামূলক বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেটা হচ্ছে বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য বাধ্যতামূলক 'সামাজিক বিজ্ঞান' বিষয়। এই বিষয়টির অকল্পনীয় গুরুভার দেখে স্তম্ভিত হয়ে ভেবেছি শিক্ষাক্রম প্রণেতারা এত অবিবেচক হলেন কি করে? তারা কি স্বপ্নলোকের মানুষ যে একেবারে ভুলে গেলেন তাদের সন্তানদের মস্তিষ্কের ধারণক্ষমতার কথা, ভুলে গেলেন শিক্ষাবর্ষের সময়ের সীমাবদ্ধতার কথা, বাস্তব পরিবেশ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক সমস্যাসহ নানাবিধ সমস্যার কথা? এই 'সামাজিক বিজ্ঞান' বিষয়টির মধ্যে রয়েছে পাঁচটি পৃথক বিষয়ের সমাহার অর্থাৎ 'একের ভিতরে পাঁচ'। এই বিষয়গুলো হচ্ছে- সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ও পৌরনীতি। এর একটি বিষয় থেকে আর একটি বিষয়ের রয়েছে সুস্পষ্ট বিভাজন এবং প্রত্যেকটি বিষয়ের পাঠ্যসূচি বেশ দীর্ঘ। পাঁচটি বিষয় মিলিয়ে মোট মূল Topics-এর সংখ্যা ৪৬টি ও Sub-Topics-এর ১৪৯টি। এ বিষয়ে প্রকাশিত বিশাল আকারের 'মাধ্যমিক সামাজিক বিজ্ঞান' নামক বইটিতে প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে অনুশীলনীসহ রয়েছে মোট ২৮৪ পৃষ্ঠা। বইটি পাঠ করে প্রতিটি বিষয়ের বিস্তার লক্ষ্য করলে সহজেই বোঝা যায় যে, পাঁচটি বিষয়ের প্রত্যেকটি ১০০ নম্বরের একটি পৃথক পত্র হতে পারে অর্থাৎ সোজা ভাষায় আমরা এই সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, ৫০০ নম্বরের পাঁচটি পত্রকে ১০০ নম্বরের একটি পত্রে ঠেসে দেয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার্থীদের ১১০০ নম্বরের পড়া নয়, মোট ১৫০০ নম্বরের পাঠ গ্রহণ করতে হবে। আরও কৌতুকের বিষয় এই যে, 'সামাজিক বিজ্ঞান' বিষয়টি স্কুলে পড়াবার জন্য সপ্তাহে মাত্র ৩টি পিরিয়ড বরাদ্দ করা হয়েছে। এতে গোটা সিলেবাসের অনেকখানি অংশই যে স্কুলে পড়ানো সম্ভব হবে না সে ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। বিষয়ের চাপ এত বেশি যে, পিরিয়ড বন্টনে সব বিষয়েই টান পড়ছে সময়ের। তাছাড়া আরও একটি সমস্যা দেখা দিচ্ছে এ বিষয়ে শিক্ষক বাছাই করতে গিয়ে। সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত পাঁচটি বিষয়ের বৈশিষ্ট্য এমন যে, কোন একজন শিক্ষকের পক্ষে সবগুলো বিষয়ে পাঠদান করা প্রায় অসম্ভব। অথচ একাধিক বিশেষজ্ঞ শিক্ষক বরাদ্দের ক্ষেত্রে স্কুলগুলো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। তবে এসব খুঁটিনাটি সমস্যার ঊর্ধ্বে যে প্রশ্নটি আমাদের কাছে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তা হল বাস্তবতার সাথে সম্পর্কবিহীন স্বপ্নবিলাসী বিশেষজ্ঞরা বিজ্ঞান শাখার ছাত্রছাত্রীদের ওপর পাঠ্যসূচির এই বিশাল বোঝা চাপালেন কেন। এতে আসলে বিজ্ঞান শিক্ষাই যে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে; অথচ আমরা আশা করি এই বিজ্ঞান শিক্ষার মাঝ থেকেই তৈরি হবে আগামীদিনের বৈজ্ঞানিক, গবেষক, আবিষ্কারক, প্রকৌশলী, চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞ শিক্ষক, অধ্যাপক প্রভৃতি জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি, যারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের ধারায় দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবেন। অথচ তাদের শিক্ষাকেই পন্ড করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

অন্যদিকে মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার জন্য সাধারণ বিজ্ঞান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং আটটি বাধ্যতামূলক বিষয়ের সাথে যুক্ত এই বিষয়টির পাঠ্যসূচির ঝোঁকও নেহাৎ কম নয়। এক কথায় বলা চলে, নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির অতিরিক্ত বোঝা বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীদের যেমন ক্ষতিগ্রস্ত করবে তেমনি মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

আর একটি বিষয়ের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। লক্ষ্য করা যায় যে, দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের গুরুত্বকে দারুণভাবে খর্ব করা হয়েছে। প্রথমত, 'উচ্চতর গণিত'কে ঐচ্ছিক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে বিষয়টির প্রয়োজনীয়তাকে খাটো করে দেখা হয়েছে। এতে বিজ্ঞান শাখাসহ সব শাখার শিক্ষার্থীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। '৯৬ থেকে শুরু হওয়া এই প্রক্রিয়ার পরিণামে আমরা দেখছি বহু স্কুলে উচ্চতর গণিত বিষয়টিকেই তুলে দেয়া হয়েছে। অথচ এবার সাধারণ গণিতের পাঠ্যসূচিতে উচ্চতর গণিতের বহু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার জন্য উচ্চতর গণিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন। একদিকে উচ্চতর গণিতের প্রতি তাচ্ছিল্য দেখানো হয়েছে অন্যদিকে সাধারণ গণিতের পাঠ্যসূচিকে কঠিন করা হয়েছে। ফলে বর্তমানে দক্ষ অংক শিক্ষকের যে অভাব রয়েছে ভবিষ্যতে তা আরও বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ভূগোলের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বাধ্যতামূলক তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে, তার পরিবর্তে গার্হস্থ্য অর্থনীতি/কৃষি শিক্ষা ও ধর্মকে এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে অগ্রাধিকার নির্ণয়ে বিরাট ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়।

নতুন শিক্ষাক্রমের গোটা পাঠ্যসূচি ও সবগুলো পাঠ্যবই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়ে সংক্ষেপে এর মূল ত্রুটিগুলো এবার তুলে ধরতে চাই। সার্বিক বিচারে মনে হয়েছে নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নকালে ছেলেমেয়েদের মস্তিষ্কের ধারণক্ষমতা, সময়ের অর্থাৎ শিক্ষাবর্ষের মোট কার্যদিবস ও পিরিয়ড সংখ্যার সীমাবদ্ধতা, শিক্ষার বর্তমান নিম্নমান, শিক্ষা সংকট, প্রতিকূল সামাজিক প কিছুমাত্র বিবেচনায় না নিয়ে (হয়তো উন্নত দেশের উন্নতমানের শিক্ষাস্তরে উন্নীত করার অভিলাষে) এই শিক্ষাক্র পাঠ্যসূচির অতিরিক্ত বোঝা চাপানোর ব্যবস্থা হয়েছে, অনেক বিষয়ের বিষয়বস্তুকে কঠি উচ্চমানের করা হয়েছে এবং অগ্রাধিকার ভিত্তি বিষয় নির্বাচন না করে প্রয়োজনীয় বিষয়ের গু কমিয়ে গৌণ বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। ধরনের ত্রুটিপূর্ণ বাস্তবতাবিবর্জিত শিক্ষাক্রমে পরিণাম ক্ষতিকর হতে বাধ্য। আমার ধারণা এ অবাস্তব ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাক্রম প্রণয়নের জন্য প্রণেতারা ততটা দায়ী নন যতটা দায়ী সরকারের নীতি-নির্ধারকরা। কারণ সরকারের নির্দেশ ছাড়া এমন মৌলিক পরিবর্তন সাধনের ক্ষমতা কি কারো আছে?

যাই হোক, এখন নতুন সরকার ক্ষমতায় আসীন। আশা করব এই সরকারের শিক্ষামন্ত্রীসহ শিক্ষা বিষয়ক নীতিনির্ধারকরা দেশের ও শিক্ষা জগতের বাস্তব অবস্থা, প্রকৃত চাহিদা, ছেলেমেয়েদের মস্তিষ্কের ধারণক্ষমতা ইত্যাদির সাথে সঙ্গতি রেখে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করবেন এবং একে ঢেলে সাজাবেন। যেহেতু চলতি শিক্ষাবর্ষে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা বইপত্র কিনে ফেলেছে সেই হেতু পাঠ্য বইয়ের কোন পরিবর্তন বা শিক্ষাক্রমের মৌলিক পরিবর্তন এ বছর কাম্য নয়। তবে চার মাস বিলম্বে পাঠ্যবই প্রকাশিত হওয়ায় সময়ের যে বিরাট অপচয় হয়েছে এবং পাঠ্যসূচির যে অতিরিক্ত বোঝা চাপানো হয়েছে তা বিবেচনায় নিয়ে ১৯৯৮-এর এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিষয়ের কাটছাঁটসহ নিম্নবর্ণিত পদ-ক্ষেপ গ্রহণের জন্য নয়া সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি ঃ

(১) ঐচ্ছিক বিষয় বাতিল করে পাঠ্য বিষয় ১০০০ নম্বরের মধ্যে সীমিত রাখা হোক।

(২) কৃষি শিক্ষা/গার্হস্থ্য অর্থনীতি ও ধর্মকে নৈর্বাচনিক বিষয়ের তালিকায় স্থানান্তরিত করা হোক।

(৩) সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের প্রতি সাম্প্রদায়িক, অগণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করা হোক।

(৪) সামাজিক বিজ্ঞানের ভূগোল বিষয়টি রেখে বাকি বিষয় বাতিল করা হোক।

(৫) সাধারণ বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচি অনুরূপভাবে কাটছাঁট করা হোক।

(৬) উচ্চতর গণিতকে নৈর্বাচনিক বিষয়ের তালিকাভুক্ত করা হোক।

(৭) বাধ্যতামূলক বিষয়কে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে অভিন্ন পাঠ্যসূচির আওতায় আনার নীতি গ্রহণ করা হোক।

আশা করি মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকার এ বিষয়ে ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।